**ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিং শহীদ আসাদ**

**প্রফেসর ড. জসীম উদ্দিন আহমদ**

**সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ**

২০ জানুয়ারি, শহীদ আসাদ দিবস। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ছাত্র-গণ আন্দোলনের এক স্মরণীয় দিন। আজ থেকে ৫২ বছর আগে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের প্ৰথম সারির সংগঠক আসাদুজ্জামান, আমাদের প্রিয় আসাদ ভাইয়ের বুকের রক্তে। আসাদ ভাই আমাদের অহংকার, আমাদের চেতনার পরতে পরতে জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় অঙ্গীকার হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

আসাদ ঊনসত্তরের ছাত্র- আন্দোলনের মশাল জ্বালানোর প্ৰথম স্ফুলিঙ্গ। ২০ জানুয়ারি তার শাহাদত প্রাপ্তির পরই ছাত্র আন্দোলন গণ আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং পতন ঘটে স্বৈরশাসক আয়ুব খানের। ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন ও ’৬৯ এর ছাত্র-গণ আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম। ওই সময়কালের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে শহীদ আসাদের আত্মত্যাগ অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছে।

সময়ের বিবর্তনে এখন আসাদ ভাইয়ের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং শহীদ হওয়ার দিন ও কয়েক দিন আগের ঘটনা নিয়ে অনেকে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রচার করছেন। আসাদ ভাইয়ের সঙ্গে খুবই গভীরভাবে যুক্ত থাকার জন্য বিভ্রান্তিগুলো দুর করার জন্য আমার এ লেখা অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে।

শহীদ 9আসাদ ভাই সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে যেমন গৌরব ও অহংকারে হৃদয় ভরে ওঠে, অন্যদিকে বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি। গৌরব আর অহংকার হয় আসাদ ভাইয়ের আন্দোলন এবং সংগ্রামের সাথী হওয়ার জন্য আর অন্যদিকে প্রিয় সহযোদ্ধাকে চিরদিনের জন্য হারানোর জন্য বেদনার অনুরণন।

আমি ও আসাদ ভাই উভয়েই নরসিংহী জেলার শিবপুরের ধানুয়া গ্রামের সন্তান। বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে শিবপুরের গৌরব উজ্জ্বল অবদান সকলেরই জানা। শিবপুর হাই স্কুলে পড়াশোনা করার সময় থেকেই আসাদ ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, যদিও তিনি আমার তিন বছরের সিনিয়র। ’৬২ শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনের সময় আমরা আন্দোলনের সহযাত্রী হয়ে উঠি। আমরা চিন্তা চেতনায়ও দুই জনই ছিলাম প্রগতিশীল। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামে ওই সময় দেশের প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ খুবই সোচ্চার ছিল। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হই, আসাদ ভাই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে সময় আমরা উভয়েই ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) নেতা আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার (পরবতী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠন এবং বি এন পি মহাসচিব ও সাবেক মন্ত্রী) বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠি। তারই নির্দেশে আমরা শিবপুর অঞ্চলে প্ৰথম দিকে ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি।

১৯৬০ দশকের প্ৰথম থেকেই যখন প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পরি, তখন থেকেই ভাসানীর অনুসারী হয়ে পরি। নরসিংদীর শিবপুরের সন্তান হওয়ায় বিভিন্ন কর্মকান্ডে ভাসানীকে পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৬৯ দশকের শেষ দিকে ছাত্র রাজনীতির পর আবদুল মান্নান ভূঁইয়া (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাবেক মহাসচিব)ভাসানীর নির্দেশে শিবপুর অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আমাদের রাজনৈতিক চেতনাকে শাণিত করার পেছনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তারই নেতৃত্বে আসাদ ভাই, তোফাজ্জল হোসেন ভূঁইয়া, আওলাদ হোসেন খান, তোফাজ্জল হোসেন খান, আবুল হারিস রিকাবদার(কালা মিঞা), ঝিনুক খান, মান্নান খান, আব্দুল আলী মৃধা, সফদারসহ আমরা চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে একই সঙ্গে কাজ করেছি। ১৯৬৫এর আন্দোলন থেকে ৬৯এর ছাত্র-গণ আন্দোলনে আমরা শিবপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংগঠনকে বেশ মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হই।

আসাদ ভাইয়ের কৃষক রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার মূল প্রেরণা ছিল, মওলানা ভাসানীর নির্দেশ, তিনি আসাদ ভাইকে খুবই পছন্দ করতেন। আসাদ ভাই কাজী জাফর ভাইয়েরও খুবই ভক্ত ছিলেন, তিনিও ওনাকে শিবপুর অঞ্চলে কৃষক সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন। সর্বোপরি ছিল মান্নান ভাইয়ের অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক নির্দেশনা।

আমরা শিবপুর ও আশেপাশের অঞ্চলে কৃষক সমিতির কাজে পড়াশোনার পাশাপাশি বেশ সময় দিতে থাকি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করতে থাকি। অনেক কৃষক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধান ও বাঁশ দিয়ে সহযোগিতা করতো। আমরা শিবপুরে কৃষক সমিতির একটি স্থায়ী অফিস নেই, অঞ্চলের আরও কয়েক জায়গায় অস্থায়ী অফিস গড়ে ওঠে। কৃষক সমিতিকে জনপ্রিয় করার জন্য আমরা মাঝে মাঝেই প্রতিযোগীতামূলক ফুটবল ম্যাচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম।

১৯৬৮এর শেষ দিকে, ৯ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী আইয়ুব-মোনেম শাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বেগবান করার আহবান জানান। লাট ভবন ঘেরাও এবং পরদিন ঢাকা শহরে সর্বাত্মক হরতাল থেকে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে।আসাদ ভাই ও আমি পল্টনের জনসভা ও লাট ভবন ঘেরাও কর্মসূচি এবং হরতাল ঘোষণার পর হরতালের সমর্থনে মশাল মিছিলে অংশ নেই। হরতালের দিন ঢাকা শহরে পুলিশের গুলিতে একজন শহীদ হন, সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

মওলানা ভাসানী আন্দোলনকে গ্রাম বাংলার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ২৯ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার সর্বত্র হাট বাজার হরতালের ডাক দেন। তিনি তহশীল অফিস ঘেরাও ও দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে শিবপুর অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া পড়ে।

২৯ ডিসেম্বর শিবপুর অঞ্চলে শিবপুর বাজার থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে পাশের থানা মনোহরদির হাতিররদিয়া বাজারের দিন ছিল। কৃষক সমিতি ওই বাজারে হরতাল আহবান করে। হরতালের সমর্থনে ছাত্র, যুব ও কৃষক কর্মীরা ব্যপক প্রচারণা চালায়। হরতালের দিন আসাদ ভাইয়ের নেতৃত্বে শিবপুর থেকে নেতা কর্মীরা হাতিরদিয়া যায় এবং ঐ অঞ্চলের কর্মীরাও যোগ দেয়। আসাদ ভাইয়ের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালনের পিকেটিংয়ের সময় পুলিশ আসাদ ভাই সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে একটি মুলি বাঁশের বেড়া দেওয়া ঘরে আটকে রাখে। জনতা ওদেরকে মুক্ত করে নেওয়ার সময় পুলিশ নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। গুলিতে সিদ্দিকুর রহমান সহ তিনজন কৃষক শহীদ হন, আসাদ ভাই আহত হন। তবে জনতা আসাদ ভাই সহ গ্রেফতারকৃত সবাইকে মুক্ত করে নিয়ে আসে। আহত অবস্থায় আসাদ ভাই পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু পথ হেঁটে, কিছু পথ সাইকেলে এবং সবশেষে ঝিনারদী স্টেশন থেকে ট্রেনে ঢাকা আসতে সক্ষম হন। তিনি নিজে খবরটি তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় পৌঁছে দেন। দৈনিক পাকিস্তানে তখন আমাদের গ্রামের শাখাওয়াত ভাই ও রমিজ ভাই সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত। তাদের সহযোগিতায় হাতিরদিয়া খবরের শিরোনামে চলে আসে, দেশ ব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। হাতিরদিয়ায় ঘটনার পরই আসাদ ভাইকে প্রধান অভিযুক্ত করে পুলিশ মামলা রুজু করে, তার নামে হুলিয়া জারি হয়। ঐ অঞ্চলের কৃষক সমিতির নেতা কর্মী ও সাধারণ জনগণের ওপর পুলিশি নির্যাতন চলতে থাকে। আসাদ ভাই হুলিয়া মাথায় নিয়েও সকলের সাথেই গোপনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন, এতে কর্মীদের মনোবল অটুট রাখায় বেশ সহায়তা করে।

হাতিরদিয়ার কৃষক হত্যা ও পরবর্তী পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে হাতিরদিয়া এবং শিবপুরে প্রতিবাদী জনসভার প্রোগ্রাম দেন মওলানা ভাসানী। সভার দিন শিবপুরের সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারী করে স্থানীয় প্রশাসন। সভাস্থলের চারদিকে পুলিশ বেষ্টনী তৈরী করা হয় আর প্রতিবাদী লোকজন যাতে সভায় আসতে না পারে সেই জন্য বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দেয়া হয়। মজলুম জননেতা ভাসানী ঢাকা থেকে এসে গাড়ি থেকে নেমে সোজা পুলিশ বেষ্টনী পার হয়ে সভাস্থলে পৌঁছেই মোনাজাতের মাধ্যমে জালিম শাহীর বিরুদ্ধে তাঁর স্বভাবসুলভ জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুরু করেন। চার দিকে থেকে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত জনস্রোত আসতে থাকে, অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই পুরো মাঠ ভরে যায়। ভাসানী বক্তৃতায় স্বৈরাচার ও জুলুম শাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সব ধরনের দমন নির্যাতন বন্ধ করার জন্য পুলিশকে হুঁশিয়ার করেন। হুলিয়া মাথায় নিয়েই আসাদ ভাই হঠাৎ করে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করেন এবং সব ধরনের জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করার জন্য সহকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। হাতিরদিয়ায় ঘটনায় সারা দেশেই তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ হঠাৎ করেই ফেটে পড়তে থাকে।

গ্রেফতার এড়ানোর জন্য আসাদ ভাই প্রথমে কিছু দিন ঢাকায় আত্মগোপন করে থাকেন। পরে কৌশলগত কারনে পরিচয় গোপন করে নরসিংদীর চরাঞ্চল, বাঞ্ছারামপুরে এক স্কুলে শিক্ষক হিসেবে চাকুরি নেন।

১৯৬৯ এর জানুয়ারির প্রথমদিকে থেকে ছাত্র সমাজ আয়ুব-মোনেম শাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার ঘোঘনা দেয়। আসাদ ভাই মাঝে মাঝেই গোপনে ঢাকা আসেন, নেতা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই সময় বিকেলে শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে আমার সঙ্গে ঢাকা করতে আসেন। কয়েকবার মুহসিন হলে আমার রুমেও রাতে থেকেছেন।

১৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯ আসাদ ভাইকে নিয়ে আমরা সন্ধ্যার পর পাবলিক লাইব্রেরি চত্তর থেকে রমনা রেসকোর্স মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে স্টেডিয়ামে যাই। ওখানে মান্নান ভাই ও আরও কয়েকজন নেতা কর্মী উপস্হিত ছিল। পরদিন সকালেই বিশেষ প্রয়োজনে আসাদ ভাইয়ের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কথা। স্টেডিয়ামের প্রভিন্সিয়াল রেস্টুরেন্টে চা নাস্তা খাওয়ার সময় আমি আসাদ ভাইকে বললাম –“আগামী কাল আমরা, ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবো, ঢাকায় এখন আন্দোলনের এত ব্যাপকতা আর এই সময় আপনি ঢাকা ছেড়ে চলে যাবেন?” আসাদ ভাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন পরে বললেন “যেতেতো মন কিছুতেই সায় দিচ্ছেনা, তবুও বিশেষ প্রয়োজনে যেতে হবে, আর পরিবারেরও প্রচন্ড চাপ”।

পরের দিন, ২০ জানুয়ারি সকালে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বটতলার সভা শেষে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে আমরা মিছিল বের করি। ফুলার রোড ধরে সলিমুল্লাহ হলের পাশ দিয়ে শহীদ মিনারের রাস্তায় উঠছি। আমি স্লোগান দিতে দিতে হাঁটছি, এই সময় কাঁধে কারো স্নেহ স্পর্শ। পেছনে ফিরে দেখি আসাদ ভাই। আমি বললাম –“আসাদ ভাই, আপনি এখানে? আজ সকালেতো আপনার ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। তিনি বললেন, “তোমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় মিছিল করবে আর আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাবো তা কেমন করে হয়? মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিলনা।“ চির সংগ্রামী আসাদ ভাই এভাবেই সব ভীরুতা আর কাপুরুষতাকে জয় করেছিলো।

এর পর আমরা পরষ্পরের হাত ধরে পাশাপাশি হেঁটে স্লোগান দিতে দিতে মেডিক্যাল কলেজের মোড় পর্যন্ত যাই। ওখানে পুলিশ আকস্মিক ভাবে মিছিলের মাঝখানে আক্রমণ করে। আসাদ ভাইয়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, আমি মিছিলের সামনের অংশের সাথে নাজিমুদ্দিন রোড হয়ে বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত যাই, ওখানে মিছিলের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ওখান থেকে রিক্সায় ক্যাম্পাসে ফিরে আসি, এসেই দেখি থমথমে নীরবতা। শুনি আমাদের প্রিয় আসাদ ভাই পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিলনা, তবে অল্পক্ষণের মাঝেই সব সন্দেহের অবসান হয়।

আসাদ ভাই ছিলেন এক আপোষহীন সংগ্রামী নেতা। তার জীবনের লক্ষ্য ছিলো এদেশের কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা। কৃষক সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে একটি শোষণহীন গনতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের স্বপ্ন তিনি জীবনভর লালন করেছেন। তাই কবি শামসুর রাহমান কথায় “আসাদের রক্তে ভেজা শার্ট আমাদের প্রাণের পতাকা”।

আসাদ বাইরের লাশ মেডিকেল কলেজ থেকে পুলিশের চোখ এড়িয়ে পরিবাবের হাতে তুলে দিতে মেডিকেলের ইন্টার্নি ডাক্তার ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মেডিকেল কলেজ নেতা ড. আশিক ও অন্যান্যরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে, সাথে নাজমা শিখাও ছিলো। আসাদের রক্ত মাখা সার্টটি ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী নাজমা শিখা লুকিয়ে রোকেয়া হলে নিয়ে আসে, পরদিন হাজার হাজার ছাত্র-জনতার মিছিলে একটি বাঁশের লাঠির ডগায় সার্টটি নিয়ে মিছিলে নেতৃত্ব দেয়। পরে শার্টটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। পর দিন ঢাকায় মওলানা ভাসানী আসাদ ভাইয়ের জানাজায় ইমামতি করেন। জনতা তাৎক্ষণিকভাবে আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তন করে “আসাদ গেট” নামকরণ করে।

আসাদ ভাইয়ের শাহাদতের ৪ দিন পর, ২৪ জানুয়ারি শহীদ হন মতিয়ার রহমান। মওলানা ভাসানী সন্তোষে এক সমাবেশ আহবান করেন এবং ওই সমাবেশ থেকে সন্তোষের নামকরণ করেন “আসাদ নগর”। ভাসানী শিবপুর শহীদ আসাদ স্মরণে অনুষ্ঠিত জনসভায় ঘোষণা করেন শহীদ আসাদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেওয়া হবেনা, অবশ্যই আয়ুব-মোনেম শাহীর পতন হবে। ঊনসত্তরের ছাত্র আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়, পতন ঘটে আইয়ুব শাহীর।

আসাদ ভাইয়ের শাহাদতের পর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি ছাত্র সমাজ স্বৈরাচার হটানোর আন্দোলনকে সুতীর্ব করার প্রত্যয় নিয়ে পালন করে। আমি তখন মুহসিন হল ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্মাদক। সভাপতি রুহুল আমীন এবং আমাদের উদ্যোগে “প্রতিরোধ” নামক একটি সংকলন প্রকাশীত হয়। এই সংকলনে কবি শামসুর রহমানের কালজয়ী কবিতা “আসাদের শার্ট” প্ৰথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি সংগ্রহে তখন হলের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মাহফুজুল্লাহ ও মহিউদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওই সংকলনে আসাদ ভাইয়ের ডাইরির দুই পাতা ব্লক করে ছাপা হয়। আমি আসাদ ভাইয়ের বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ার রশিদুজ্জামানের কাজ থেকে ডাইরি সংগ্ৰহ করেছিলাম। “প্রতিরোধে” আমার একটি নিবন্ধ “আসাদ ভাইয়ের মন্ত্র জনগনতন্ত্র”” প্রকাশিত হয়। সংকলনটি সারা দেশের সুধী মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। “আসাদ ভাইয়ের মন্ত্র জনগনতন্ত্র” বিভিন্ন মিটিং মিছিলে সবসময়ই উচ্চারিত হতো।

কাজী জাফর ভাই আসাদ ভাইকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আসাদ ভাই শীতকালে সবসময়ই একটি মাফলার পড়তেন। আসাদ ভাই শহীদ হওয়ার পর পরিবাবের পক্ষ থেকে এই মাফলারটি জাফর ভাইকে উপহার দেয়া হয়েছিল।

আসাদ ভাইয়ের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য মান্নান ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা শিবপুরে শহীদ আসাদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করি। কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রাথমিক পর্যায়ে ওই অঞ্চলের অনেকেই জমি দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমার মরহুম পিতা রায়হান উদ্দিন আহমদ সবচেয়ে বেশি জমি প্রদান করেন। কলেজটি বেশ কয়েক বছর আগে সরকারিকরন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার কয়েক বছর , ২০১৮ সালেফ শহীদ আসাদকে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করেছেন। অবশেষে জাতির এই সূর্য সন্তানকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হলো।

এ কথা বেশ দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, শহীদ আসাদের আত্মত্যাগ ব্যতীত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণতা লাভ এত দ্রুত কোন ভাবেই সম্ভব হতোনা। এতে আমরা তার সঙ্গে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছি বলে গর্বিত।

এ কথা, দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলা যায়, আসাদের রক্তমাখা শার্ট -আমাদের প্রানের পতাকা, যুগ যুগ ধরে সকলের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।